শ্যামাপ্রসাদ

প্রকাশক :
বলরাম ঠাকুর
শঙ্খনাদ প্রকাশন
৩৬-এ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রকাশকাল : ১২ জানুয়ারি, ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশকাল : জন্মাষ্টমী - ২০১৯

মুদ্রক :
নিউ ভারতী প্রেস
কলকাতা -৬

সহযোগ রাশি : কুড়ি টাকা মাত্র

বাংলায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হল— "যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর"— ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদের জীবনে এই প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে বঙ্গভূমিতে আজকে আমরা বসবাস করছি, আর ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যে বঙ্গভূমিকে তোষণের রাজনীতির মাধ্যমে পুনরায় বিভাজনের দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছি সেই বঙ্গভূমি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে জিন্নার স্বপ্নের পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে সার্থক করতে নিজেকে বলি দিয়েছিলেন দু-হাজার কিলোমিটার দূরে শ্রীনগরের মাটিতে, কিন্তু আমরা বাংলার মানুষ কিছু বিদেশের দালালদের চক্রান্তে, কিছু ক্ষমতালোভী তোষণকারীদের ষড়যন্ত্রে তাঁর ললাটে এঁকেছিলাম 'সাম্প্রদায়িক' তক্‌মা। হায় রে ভাগ্য— যারা প্রাণভয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গেল, এখানে বসে রাজনীতি করে ব্যক্তিস্বার্থ পূরণ করল, তারা হল সেকুলার আর পাকিস্তান ভেঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করে, দেশের অখণ্ডতায় জীবন আহুতি দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ হলেন সাম্প্রদায়িক!

যে শ্যামাপ্রসাদকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে প্রকাশ করাই এই ছোট্ট পুস্তিকার উদ্দেশ্য। জানি, একাজ বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন, কিন্তু দূরদর্শী, কর্মযোগী সেই অকুতোভয় মানুষটিকে জানার আগ্রহ নির্মাণ হলেই এই পুস্তিকার লক্ষ্য পূরণ হবে।

১২ই জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকাশক

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

এই সংসারে এমন মানুষ খুবকমই আছেন যিনি মাত্র ৫২ বছরের জীবনের শেষ ১৪ বছর রাজনীতিতে ছিলেন, আর এই অল্প সময়েই ইতিহাস রচনা করে অমর হয়েছেন। সেই অল্প সংখ্যক মানুষের একজন ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায়, কিন্তু মৃত্যু হয়েছিল কাশ্মীরের শ্রীনগরে এক রহস্যজনক পরিস্থিতিতে যেখানে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং তার প্রিয় সহযোগী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দুজনেই অল্পায়ু ছিলেন। দুজনের মৃত্যুই ছিল রহস্যঘেরা-বেদনাদায়ক। দুজনেই মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন।

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৪-১৯২৪) দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একজন শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী হিসাবে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্যার আশুতোষ তার পুত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে করেছিলেন যার ফলে বড় পুত্র রমাপ্রসাদ আইনের ছাত্র হিসাবে ও ছোট পুত্র শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাবিদ রূপে পরিচিতি লাভ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং এম.এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পাশ করেন। এরপর আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করে ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডকেট সদস্য হন। সিন্ডিকেটে তিনিই সব থেকে বয়সে ছোট ছিলেন।

সেই সময় ভারতে দ্বৈত্ব শাসন পদ্ধতি চালু ছিল যা ভারতীয়দের পক্ষে অনুকূল ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হিসাবে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে ১৯২৯ সালে বিধান পরিষদের সদস্য হন। এরপর পরই কংগ্রেস বিধান

পরিষদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। শ্যামাপ্রসাদ এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলেন না। বিধান পরিষদে নির্দলীয় সদস্য রূপে ফিরে আসার জন্য তিনি পদত্যাগ করেন। এরপরই তিনি রাজনীতির থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে বেশি মনোযোগ দেন।

যুবক শ্যামাপ্রসাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কাজ দেখে বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাকে 'যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান' বলে সম্মান জানান। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য হয়ে শ্যামাপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। ১৯৩৪-৩৮ তিনি দুবার উপাচার্য্য মনোনীত হন। উপাচার্য থাকাকালীন তিনি ভারতীয় মানসিকতায় ভারতীয় ইতিহাসের উপর বিশেষভাবে গবেষণা করার জন্য জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষকদের প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। ভারতীয় পূরাতত্ত্বের সংগ্রহশালা তৈরী, ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়ার জন্য বিদেশী ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। ১৯৩৭ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষান্ত সমারোহে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন যেখানে কবিগুরু বাংলাভাষাতেই তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি শ্যামাপ্রসাদের ছিল এমনই টান। এই প্রথমবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বাংলা ভাষাতে হয়েছিল।

পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। বড় বোন কমলাদেবী বিধবা হন। কিছুদিন পর তাঁরও মৃত্যু হয়। এই সময়েই ১১ বৎসরের বিবাহিত জীবনে চার সন্তানের জননী স্ত্রী সুধাদেবীর মৃত্যু হয়। বড় দাদা রমাপ্রসাদ ও বৌদি তারাদেবী সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিলে শ্যামাপ্রসাদ আরও বেশী করে সামাজিক জীবনে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার 'ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' চালু করে। যার ফলে সংসদে আরও বেশী ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতি প্রদেশে ভারতীয়দের দ্বারা নির্বাচিত একটি সরকার তৈরী হতে পারবে কিন্তু এটির পরিচালনা ভার ইংরেজ প্রশাসকদের হাতেই থাকবে।

এই আইনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নষ্ট করে (মুসলিমদের জন্য আলাদা নির্বাচন ক্ষেত্র) মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে

মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাংলায় তখন পর্যন্ত মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব খুব বেশী ছিল না। বাংলায় বেশীর ভাগ জমিদার ও মোল্লা মৌলবিরাই মুসলিম লীগের নেতৃত্ব করত। অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান আবুল কাসিম ফজলুল হকের সমর্থক ছিল। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে এমন মুসলমান নেতৃত্বের খোঁজ শুরু হল। বাংলার হিন্দু সমাজ ও হিন্দু নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন বাঙালী হিন্দুদের দুর্দশার দিন শুরু হতে চলেছে। সকলে মিলে শ্যামাপ্রসাদকে শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে রাজনীতির জগতে প্রবেশ করার আবেদন করলেন। এই ভাবেই শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষা ক্ষেত্রের আঙ্গিনা ছেড়ে রাজনীতির জটিল চক্রে প্রবেশ করেন। কেউ কেউ মনে করেন শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি শুনে চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি। হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্র ছেড়ে তিনি রাজনীতির ময়দানে হাজির হয়েছিলেন। ইংরেজের ষড়যন্ত্র ও মুসলিম লীগের পরিকল্পিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রণনীতি তৈরী করেছিলেন।

এই সময় রাজনীতিতে তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। বাংলায় কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে কখনও কিছু বলত না, মুসলিম লীগের প্রবল সাম্প্রাদিয়ক রাজনীতির সামনে নীরব, নতজানু অবস্থা ছিল। বাংলার কমিউনিষ্টরা মুসলিম লীগকে সমর্থন তো করতই অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার মত দল যারা হিন্দুদের হয়ে কথা বলত তাদের সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল বলে গালি দিত। মজার ঘটনা হল আজও কমিউনিষ্টদের চরিত্র সেদিনের মতই রয়ে গেছে। প্রায় সত্তর বছর পরেও তাদের ভাবনার কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই কঠিন সময়ে যারা ডাঃ মুখার্জীকে রাজনীতিতে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—এন.সি. চ্যাটার্জী (প্রাক্তন লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চ্যাটার্জীর বাবা), আশুতোষ লাহিড়ী, জাস্টিস মন্মথনাথ মুখার্জী এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ। শ্যামাপ্রসাদের কাছে স্বামীজী এক অখন্ড প্রেরণার উৎস ছিলেন।

এই সময় শ্রী মুখার্জী ফজলুলহকের নেতৃত্বাধীন কৃষক প্রজা পার্টীর সমর্থক ছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টী মূলত বাংলার কৃষক সমর্থক পার্টি ছিল

যার বেশির ভাগ সদস্যই মুসলমান হলেও পার্টীর সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষই ছিল। ডঃ ফজলুল হকও ব্যক্তিগত ভাবে মৌলবাদ সমর্থক ছিলেন না। বাংলায় তখন তিনটি দল প্রভাবশালী ছিল। কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি।

১৯৩৯ সালের নির্বাচনে প্রান্তের আইন সভায় কোন দলই সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় নি। ফলে সরকার গড়া নিয়ে জোড়াতালির খেলা শুরু হয়। বাংলার বেশীর ভাগ কংগ্রেস নেতারা চাইতো যে কংগ্রেস তুলনামূলক কম সাম্প্রদায়ীক হক সাহেবের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকারের দখল নিক। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। ফলে ক্ষমতা দখলের জন্য হক সাহেবকে মুসলিম লীগের সমর্থন নিতে হয়, যদিও হক সাহেব মুসলিম লীগ এর বদলে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় বেশী আগ্রহী ছিলেন। কারণ হক সাহেবের আশঙ্কা ছিল মুসলীম লীগের সঙ্গে জোট বাঁধলে কৃষক প্রজা পার্টীর ভোট ব্যাঙ্ক মুসলিম লীগ নিয়ে নেবে, যেহেতু দুই দলের বেশীর ভাগ সমর্থকই মুসলমান। হক সাহেবের এই আশঙ্কা পরবর্তী কয়েক বছরে সত্য প্রমাণিত হয় এবং স্বয়ং হক সাহেবকে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই ভুলের ফল বাঙালী হিন্দু তার জীবন, নারীর সম্মান ও ভিটে মাটি ছেড়ে আজও দিয়ে যাচ্ছে।

মুসলীম লীগ ধীরে ধীরে ক্ষমতার রাস নিজের হাতে নেয় এবং চরম সন্ত্রাস শুরু করে। প্রশাসনের সর্বস্তরে নিজেদের লোক বসানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। বেসরকারী তথ্য অনুযায়ী তখন হিন্দুদের সরকারী চাকরীতে নেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪০ সালে অসাম্প্রদায়ীক ফজলুল হক চরম সাম্প্রদায়ীক মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং মুসলিমলীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান তৈরির প্রস্তাব করেন।

বাংলার নানা জায়গায় বাঙালী হিন্দুদের উপর চরম আঘাত নেমে আসে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপে রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার সাহস পায় না, যদিও বহু কংগ্রেসী নেতা ব্যক্তিগত স্তরে হিন্দুদের পক্ষে দাঁড়ায়। আসলে তৎকালীন নেহেরু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসর এক অংশ কোন ভাবেই বাংলা কংগ্রেসকে সক্রিয় হতে দিতে

চাইত না। শ্রী মুখাজী বাঙালী হিন্দুর উপর নেমে আসা এই চরম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। নিজের প্রতিবাদকে শক্তিশালী করতে তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনীতিতে যোগ দেওয়াকে স্বাগত জানান গান্ধীজী। গান্ধীজীর ভাষায় পন্ডিত মদন মোহন মালব্যের পর হিন্দুদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজনের দরকার ছিল। জবাবে শ্রী মুখার্জী বলেন, কিন্তু আপনি তো আমাকে সাম্প্রদায়িকই বলতেন।' এর উত্তরে গান্ধীজী বলেন, সমুদ্র মন্থনের শেষে সমস্ত বিষ যেমন মহাদেব ধারণ করেছিলেন তেমনি ভারতীয় রাজনীতির সমস্ত বিষ ধারণ করার জন্য তো কাউকে দরকার।" গান্ধীজী শ্রীমুখার্জীর যোগ্যতা ও তার নেতৃত্বগুণ সম্পর্কে জানতেন। তাই তিনি প্রায় জোর করে জহরলাল নেহেরুকে বাধ্য করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমন্ত্রক দিতে। হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়ার পর প্রথম এক বছরে শ্রী মুখার্জী সম্পূর্ণ বাংলাকে চষে ফেলেন। সমস্ত ভেদাভেদ মুছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তিনি হিন্দুদের একজোট হওয়ার আহ্বান জানান। সারা বাংলায় তার নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভা জীবন্ত হয়ে ওঠে। শ্রী মুখার্জীর নেতৃত্ব ও গুণ সম্পর্কে শ্রীসভারকর আগেই পরিচিত ছিলেন। হিন্দু মহাসভাকে সারা বাংলায় জীবন্ত করে তোলার সাফল্য শ্রী সভারকরকেও উৎসাহিত করে। হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়ার এক বছরের মধ্যে সাভারকর তাকে হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি ঘোষণা করে সমস্ত সাংগঠনিক শক্তি তার হাতে তুলে দেন। এবার শুরু হয় শ্রী মুখার্জীর সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দু মহাসভাকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যপক ভারত ভ্রমণ। ইতিমধ্যে তিনি সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। শ্রী মুখার্জীর জ্ঞান, নেতৃত্বশক্তি, লক্ষ্যের প্রতি সমর্পণ, বাচনভঙ্গি, মানুষের মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা তাকে সারা দেশে জনপ্রিয় করে তোলে। সারা দেশের হিন্দুদের কাছে তিনি আশার আলো হিসেবে দেখা দেন।

১৯৪০ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের লাহোরে আয়োজিত এক সভায় শ্রী মুখার্জী বলেন, আমি মনে করি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ভারতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একমাত্র আশার কিরণ।

শ্রী মুখার্জী বাংলার তৎকালীন মুসলিমলীগ সরকারের নানা

হিন্দুবিরোধী পদক্ষেপকে এক এক করে রুখে দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে মুসলীম লীগ প্রশাসনের সর্বস্তরে নিজের লোক বসানোর খেলায় মেতে উঠেছিল। লীগ সরকার এবার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজ করতলে আনার প্রচেষ্টা শুরু করে। তারা মাধ্যমিক শিক্ষাকে সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে যাতে শিক্ষার জেহাদীকরণ করা যায়। কারণ তখন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রাধিকারে। যেহেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ আনা কঠিন তাই লীগ সরকার সরাসরি মাধ্যমিক শিক্ষাকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে এনে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের হাতে তুলে দেয় যেখানে লীগ সদস্যরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। শ্রী মুখার্জী এর ব্যাপক বিরোধীতায় নামেন। আইন সভার ভেতরে এবং বাইরে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন। এই আন্দোলন শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজের লোকেদের কাছেই মান্যতা পায় এমনকি ব্রিটিশদের মধ্যেও অনেকে শ্রীমুখার্জীর সমর্থনে এগিয়ে আসে।

হিন্দু মহাসভার এই আন্দোলনকে কংগ্রেস সমর্থন করতে বাধ্য হয়। ফলে বিধান পরিষদে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধ শুরু হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরোধীতার সূত্রে আমরা শ্রীমুখার্জীর সংবিধানিক জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় পাই। এই বিরোধীতা রাস্তায় নেমে কোন বিরোধী আন্দোলন ছিল না বরং এটা ছিল সংসদীয় বিরোধ। আইনসভার ক্ষমতা বনাম সরকারের ক্ষমতার লড়াই। আইনসভায় নাকানি চুবানি খেয়ে লীগ সরকার বাংলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। ঢাকা, নোয়াখালি, নারায়নগড় সহ নানা জায়গায় ব্যাপক হিন্দু হত্যা, নির্যাতন শুরু হয়। শ্রীমুখার্জী বিপদের এই সময়ে হিন্দুদের পাশে দাঁড়াতে ঢাকায় যেতে চাইলে ব্রিটিশ সরকার বাধা দেয়। অনেক বাধা টপকে লীগ সরকার ও ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে শ্রীমুখার্জী ঢাকায় পৌঁছান। তিনি সরাসরি ঢাকার নবাবের বাসভূমিতে পৌঁছে তাকে দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ করার কথা বলেন। তাদের মধ্যে নরমে গরমে কি কথা হয়েছিল তা আজও অজানা কিন্তু দাঙ্গায় উসকানি দাতা নবাব সহযোগিতা করবেন বলে কথা দেন। শ্যামাপ্রসাদ তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে ৫ দিন থেকে দাঙ্গা প্রভাবিত এলাকায় ভ্রমণ করেন ও মুসলিম লীগের আসল মুখ বিশ্ব

সংবাদ জগতের সামনে তুলে ধরেন। যেহেতু বাংলায় মুসলিম লীগের ভয়ে ভীত সংবাদ জগত ও সারা ভারতের কংগ্রেস পোষিত সংবাদ জগত হিন্দু নির্যাতনের তথ্য প্রকাশ করছিল না। তাই তিনি একে ব্রিটিশ মিডিয়ার নজরে আনার প্রয়াস করেন।

শ্রী মুখার্জী গান্ধীজীকে লীগের সাম্প্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে মুখ খোলার আহ্বান জানান। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীও শ্যামাপ্রসাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানান। ফলে সারা দেশের মানুষ মুসলিম লীগের হিন্দু নির্যাতনের কথা জানতে পারে।

১৯৪১ সালে শ্রী মুখার্জী ফজলুল হককে মুসলিম লীগের ক্যাম্প থেকে বের করে আনেন। সেই সাথে হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা পার্টী ও কংগ্রেস একসঙ্গে সরকার গঠন করে। ঠিক ছিল যে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন তাই বলা হত) এবং ঠিক পরের স্থান কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু পাবেন কিন্তু ব্রিটিশরা হঠাৎ শরৎ বসুকে গ্রেফতার করায় ফজলুল হক সেই স্থান শ্রীমুখার্জী হাতে তুলে দেন। এই মন্ত্রীসভা এতটাই জনপ্রিয় হয় যে একে শ্যামা-হক ক্যাবিনেটও বলা হয়।

তখন বাংলার হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের মানুষের মধ্যেই সদ্‌ভাব বজায় ছিল কারণ জেহাদী মুসলমানরা জানত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মন্ত্রীসভায় রয়েছে ফলে চারিদিকে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ১৯৪২ সালে তিনি ব্রিটিশ গভর্নরকে চিঠি লিখে বলেন, ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার আমাদের কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। শত বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সংবিধান হিন্দু মুসলমানকে এক যোগে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আমরা তা করছিও কিন্তু যে ভাবে কিছু মানুষ সাম্প্রদায়ীকতা ছড়াচ্ছে তাতে ব্রিটিশ সংবিধানের অসারতা কিছুদিনেই প্রমাণিত হবে।

ইংরাজদের মধ্যেও মুসলীম লীগের বিরোধীতা শুরু হয় এবং লীগ একলা হয়ে যায়। মুসলিম সমাজও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল। শ্রী হক বলতেন, শ্রী মুখার্জী হিন্দুমহাসভার নেতা এটা ভুলে যাও। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলছি হিন্দুদের মধ্যে এর থেকে বেশী উদার ও মুসলিমদের হিতচিন্তক আর দুটি পাবে না।'

১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত লীগ মন্ত্রীমন্ডল হিন্দুদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করেছে। এই সময়ে পুরো বাংলার উন্নয়ন থমকে ছিল। তৎকালীন বাংলার গভর্নর হার্বার্ট এই লীগ মন্ত্রীমন্ডলদের ঘৃণা করতেন। তাই তিনি বুদ্ধি করে ১৯৪২ সালে এই মন্ত্রীমণ্ডল ভঙ্গ করে দেন। এই সময়ে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের আহ্বান করে। ফলে সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের জেলে বন্দী করা হয়।

১৯৪২ সালে অক্টোবর মাসে বাংলার মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে বিধ্বংসী সুনামী আসে। যাতে ১৫ মিনিটের মধ্যে ৩০,০০০ হাজার মানুষ মারা যায়। প্রচুর মানুষ অনাথ এবং গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই সময় জাপানী সৈনিকেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সেখান থেকে ইংরেজদের তারিয়ে বর্মা দখল করে নেয়। এই দেশে হাবার্ট ঘাবড়ে গিয়ে রক্ষণাত্মক নীতি নেয়। যেসব খাদ্য সামগ্রী সেনাদের জন্য অপ্রয়োজনীয়, সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়। এক মন চালের দাম ২ টাকা থেকে বেড়ে ১০০ টাকা হয়ে যায়। ভয়াবহ আকাল দেখা দেয়। তাতে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এমন পরিস্থিতিতেও অটুট রাষ্ট্রবাদী চিন্তাভাবনা এবং মানুষের মধ্যে বিপ্লবী উৎসাহের কারণে আকাল প্রভাবিত এলাকায় যে ত্রাণ কাজ চলছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার তা বন্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে। ডঃ মুখার্জী নিজে ত্রাণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই ত্রাণ কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে জোটবদ্ধ করতে তিনি সমন্বয়কারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি না থাকলে, নিহতের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী হত।

এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪৫) চরম পর্যায়ে চলছিল। সমস্ত কংগ্রেস নেতা জেলে বন্দী। শুধুমাত্র মুসলীম লীগের সব নেতা জেলের বাইরে ছিল। তারাই বাংলা শাসন করছিল। অসুস্থ মহাত্মা গান্ধীও তখন জেলে বন্দী। তাঁর শরীর লাগাতার খারাপের দিকে যাচ্ছে। অসুস্থতার কারণে জেলে গান্ধীজির মৃত্যু হলে দেশে হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে, এই ভয়ে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে কংগ্রেস নেতাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নেতাদের নায়কোচিত স্বাগত জানানো হয়। কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের নির্বাচন হয়। নির্বাচনের পূর্বে শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেসের

সঙ্গে একসাথে কাজ করার প্রচেষ্টা করেন কিন্তু শরৎচন্দ্র বোস শ্যামাপ্রসাদকে কোন রকম আমল দেননি। এই সময়ে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ পুরো দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। হিন্দুরা কংগ্রেসকে সমর্থন করে, মুসলিমরা লীগকে। মুসলীম লীগের বিরোধীতাকারী বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি বা পাঞ্জাবের ইউনিয়ন পার্টির মত দলগুলি হয় লীগের সামনে মাথা নত করে নেয়, নতুবা লীগে নিজেদের বিলয় ঘটায়। লীগের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াইকারী গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নেতা আল্লাহ বক্সকে হত্যা করা হয়। পরিণাম স্বরূপ এবং কংগ্রেসের তুচ্ছাতার কারণে শ্যামাপ্রসাদ অত্যন্ত অপমানিত এবং অসহায় বোধ করতে থাকেন। এর ফলে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয় এবং তিনি পুরোপুরি বিছানা নেন।

১৯৪৬ সালে ব্রিটেনে লেবার পার্টি সরকার গঠন করে। নতুন প্রধানমন্ত্রী হন ক্লীমেন্ট এ্যাটলি। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্ভাবনার দিক ক্ষতিয়ে দেখার জন্য ক্যাবিনেট মিশন নামে একটি শক্তিশালী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাবিনেট মিশন একটি সামুহিক যোজনা তৈরি করে, যেখানে ভারত বিভাজন হবে না বলে উল্লেখ করে। প্রথমদিকে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই তা স্বীকার করে নেয়। সেই সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের স্থলে কংগ্রেসের অধ্যক্ষ হন জওহরলাল নেহেরু। অধ্যক্ষ হয়ে হঠাৎ তিনি কারও সাথে কোন রকম আলাপ আলোচনা না করে যোজনার স্বীকৃতিকে অস্বীকার করেন। জিন্নাও তৎক্ষণাৎ মত পরিবর্তন করেন ও নিজ স্বীকৃতি তুলে নেন এবং ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে দেন। এর পরের চারদিন কলকাতাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গাতে প্রায় ১৫,০০০ মানুষ মারা যায়। শ্যামাপ্রসাদ তখন বাংলার প্রান্তীয় বিধান পরিষদের সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় বাংলাতে হুসেন শহিদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মুসলীম লীগের শাসন ছিল। তিনিই এই হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের নায়ক। প্রান্তীয় পরিষদে শ্যামাপ্রসাদ দাঙ্গাতে ইন্ধন দেবার কারণে সুরাবর্দীকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার কোন অখিল ভারতীয় কংগ্রেস নেতা দাঙ্গার পর কলকাতা আসার প্রয়োজন মনে করেননি। হয়ত এই ভয়ে যে, কলকাতা আসলে তাকে মুসলমান বিরোধী বলে মনে করা হবে।

এরপর কংগ্রেস ব্যবহারিক রূপে বিভাজন মেনে নেয়। এই আলোচনার পূর্বে শ্যামাপ্রসাদ অনবরত গান্ধীজীকে পাকিস্তান বিষয়ে সহমত না হওয়ার পরামর্শ দিতে থাকেন। কিন্তু গান্ধীজী তাতে কর্ণপাত করেন নি। অপরদিকে জিন্না পাকিস্তানের ব্যাপারে অনড় থাকে। এই সময় ভারতে ভাইসরয় হন লর্ড মাউন্ডব্যাটন। মাউন্টব্যাটন এবং তার স্ত্রী এ্যাডবিনা দুজনে জওহরলালকে দেশ ভাগের ব্যপারে রাজী করিয়ে নেয়। নেহেরুও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন। ৩ জুন ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেন। কিন্তু ঘোষণা মতো বাংলা এবং পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দেশ বিভাজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর ডঃ মুখার্জী বাঙালী হিন্দুদের জন্য আলাদা মাতৃভূমির সমর্থনে জনতার রায় একত্রিত করেন। সেই রায়-এর ভিত্তিতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়ে মুসলমান বহুল রাংলার বিভাজন মেনে নেয়। সেই সঙ্গে হিন্দু বহুল বাংলার অংশকে ভারতবর্ষের সঙ্গে রাখতে শ্যামাপ্রসাদ ইংরেজদের বাধ্য করেন।

বাংলা বিভাজনে ডঃ মুখার্জীর তৈরী যোজনা এবং জোড়ালো দাবী বাস্তবে পরিণত হয়। তিনি কংগ্রেসীদের এবং বাংলার অন্যান্য নেতাদের মত পরিবর্তন করতে সফল হন। মার্চ ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের বাঙালী হিন্দু সদস্যরা হিন্দু মহাসভার এন.সি চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে আই.এন. এ এবং এ.সি. চ্যাটার্জীর সমর্থনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তারপরেই ডঃ মুখার্জী বাংলার সমস্ত প্রান্ত থেকে হিন্দু প্রতিনিধিদের দ্বি-দিবসীয় সম্মেলনের ডাক দেন। হিন্দু মহাসভার সদস্য ছাড়াও পুরো বাংলা থেকে অন্যান্য প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়। আর.সি মজুমদার, ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জীদের মত বুদ্ধিজীবী তথা বিদ্বান, সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, লর্ড সিনহা ছাড়াও আরও বহুলোক এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিতে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়, তাতে বলা হয়, 'বাংলার হিন্দুবহুল ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলাদা একটি রাজ্য নির্মাণ করা হোক। ডঃ মুখার্জীর এই বাংলা বিভাজন যোজনা বিপুল পরিমাণে সমর্থন পায়। অমৃতবাজার পত্রিকার মত প্রথম শ্রেণির পত্রিকা

জনতার রায় গণনা করায় ৯৮.৬ শতাংশ মানুষ বাংলা বিভাজনের পক্ষে এবং মাত্র ০.৬ শতাংশ মানুষ বিপক্ষে রায় দেয়। ডঃ মুখার্জী এপ্রিলে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলা বিভাজন কেন প্রয়োজন তা স্পষ্ট করে দেন। এই ভাবে ডঃ মুখার্জীর সশক্ত হস্তক্ষেপ এবং অদ্বিতীয় নেতৃত্ব ক্ষমতার কারণে বাংলার একটা অংশকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই ভাবে ঐতিহাসিক শহর কলকাতাকে মুসলীম লীগ শাসিত পাকিস্তানের অংশ হওয়া থেকে বাঁচান যায়। নিশ্চিতভাবে এটা শ্যামাপ্রসাদের জীবনে একটা বড় উপলব্ধি। মুসলীম লীগ এই বাংলা বিভাজনের বিরোধীতা করে, কারণ তারা সম্পূর্ণ বাংলাকে বিশেষ করে কলকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। যখন তারা দেখল যে সোজাভাবে বাংলা দখল করা সম্ভব নয়, তখন তারা কিছু মর্যাদাহীন কংগ্রেস নেতাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে এবং এক নতুন বাংলা তৈরীর প্রচেষ্টা করে যেটা ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ের থেকে স্বাধীন হবে। ডঃ মুখার্জী এর তীব্র বিরোধীতা করে এই প্রস্তাবকে বিফল করতে সফল হন। এইভাবে কলকাতা সহ বাংলায় একটা বৃহৎ অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচান সম্ভব হয়।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার শাসন ক্ষমতা কংগ্রেসকে হস্তান্তর করে দেয়। শ্যামাপ্রসাদ তখন হিন্দু মহাসভাতে ছিলেন। ১৯৪৭ সালে গোড়ার দিকে তিনি তাঁর পুরোনো নির্বাচন ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিধানসভা ক্ষেত্র থেকে বাংলা বিধান পরিষদের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, লোকপ্রিয়তা এবং স্বীকৃতি এতটাই বেশী ছিল যে এক নতুন সংবিধানের রূপরেখা তৈরীতে বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারতের সংবিধান সভার জন্য শ্যামাপ্রসাদকে মনোনিত করেন। সংবিধান সভায় তাঁর মার্গদর্শন অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়েছিল। সংসদীয় সংরচনাতে তিনি কুশলতার সঙ্গে অনেক স্থানে যুক্তিপূর্ণ হস্তক্ষেপ করেন। কিছু প্রস্তাবের প্রতি উভয় সংবিধান সভার কাজে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তিনি যা বলেন, তা তাঁর উল্লেখনীয় সাহসিকতার পরিচয়। শ্যামাপ্রসাদ যখনই বুঝতে পারলেন যে সম্ভাবিত গন্ডগোলের পিছনে কিছু সাম্রাজ্যবাদী পদাধিকারীদের হাত

আছে, তখন তিনি বলেন যে—মহাশয় আমরা ব্রিটিশ জনগণকে শেষ বারের মত বলব যে আমরা আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। আপনারা ব্যবসায়ীরূপে ভারতে এসেছিলেন। আপনারা মোগলদের সমীপে যাচক হয়ে আসেন। এই দেশের ধন সম্পদ আপনারা নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ভাগ্য আপনাদের সহায় ছিল। প্রতারণা, ধোঁকাবাজি এবং বল প্রয়োগের সাহায্যে এখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব ইতিহাসের কথা। আপনারা এই দেশ শাসন করেছেন কিন্তু আপনারা এখানকার মানুষজনের সহযোগ নেননি। পৃথক নির্বাচন ক্ষেত্রের নীতি শুরু করে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতায় মিশ্রণ ঘটান। এই সব কাজ ভারতীয়রা করেনি। এই সব করেছেন আপনারা। আপনারা এই সব করেছেন এই কারণে যাতে আপনাদের শাসন বজায় থাকে।

ডঃ মুখার্জী সংসদীয় কাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সংসদীয় তর্কবিতর্কে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। এই কারণে তিনিও প্রশংসনীয় এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজের ফলে সেই সময় তিনি বাংলায় একচ্ছত্র নেতা হয়ে যান। তিনি তখনও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্ব করছিলেন। শ্যামাপ্রসাদকে ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভাতে নেওয়ার জন্য গান্ধীজী আগ্রহ প্রকাশ করেন। গান্ধীজী কারণ হিসাবে বলেন যে—স্বাধীনতা সংযুক্ত প্রচেষ্টার ফল। শুধুমাত্র কংগ্রেস নয়, দেশের সমস্ত রাষ্ট্রবাদী শক্তির সংগ্রামের কারণে স্বাধীনতা এসেছে। তাই প্রথম মন্ত্রীসভাতে ব্যাপক প্রতিনিধিত্ব হওয়া উচিত, যাতে সঠিক অর্থে এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সরকারের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। শ্যামাপ্রসাদ প্রথমদিকে ইতস্তত করছিলেন কারণ তিনি দেশ বিভাজনের ব্যাপারে কংগ্রেসের কাপুরুষোচিত আচরণ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর মত বীর সাভারকরও চাইছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ক্যাবিনেটে থাকুন। যাতে তিনি স্বাধীন ভারতে কাজ এবং সেবা করার সুযোগ পান এবং রাষ্ট্রীয় সরকার তাঁর কারণে সশক্ত হয়। সাভারকর সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তাই তিনি স্বাধীন দেশের প্রথম সরকারকে রাষ্ট্রীয় সরকার রূপে দেখেছিলেন। যেখানে ভারতের একতার জন্য দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে হবে। কংগ্রেসের

নেতারা অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে সাভারকরের ভূমিকা এবং ভারতের একতা বজায় রাখতে তার ভূমিকাকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করে। শ্যামাপ্রসাদকে মন্ত্রীসভায় সদস্য করা হয়। যদিও তাঁর স্বাভাবিক রুচি এবং বিশেষ ক্ষেত্র হল শিক্ষা। তিনি খুব কম বয়স থেকেই শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যদি তাকে শিক্ষামন্ত্রী করা হত তাহলে হয়ত তিনি ভারতের শিক্ষানীতিকে এক নতুন দিশা দিতেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয়তা, রাষ্ট্রীয়সেবা, দেশভক্তিতে পরিপূর্ণ যুবামনকে নতুন ছাঁচে গড়া অনেক সহজ হত। কিন্তু সেই সময় দেশের সামনে বাণিজ্যিক এবং আর্থিক চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক বেশী। তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ একমাত্র নেতা ছিলেন যিনি নির্ণায়ক সময়ে কুশল এবং অনুভবী নেতৃত্ব ক্ষমতার পরিপূর্ণ ছিলেন।

উল্লেখনীয়, শ্যামাপ্রসাদকে স্বাধীন ভারতের মন্ত্রীসভাতে নেওয়ার চূড়ান্ত পক্ষপাতী ছিলেন সর্দার প্যাটেল। বাংলা বিভাজনের দাবীতে শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার জোরদার প্রশংসক ছিলেন প্যাটেল। তিনি মনে করতেন শুধুমাত্র শ্যামাপ্রসাদের জন্যই জিন্নার পাকিস্থান থেকে একটা বড় ভূভাগকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। মুসলীম লীগের স্বপ্নের অখন্ড স্বাধীন বাংলার তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। এই বিরোধীতার সময়ে সর্দার প্যাটেল শ্যামাপ্রসাদের বড় সমর্থক ছিলেন। উভয় বিষয়েই তার নেতৃত্ব ক্ষমতা ভারত এবং হিন্দুদের বাচিয়ে দেয়। ক্যাবিনেটে ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ও ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে অন্তর্ভুক্ত করাতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেন সর্দার প্যাটেল। অপরদিকে শ্যামা প্রসাদ সর্দার প্যাটেলের একজন বড় অনুরাগী ছিলেন। সর্দার প্যাটেলের ভারতীয় একতা তৈরির মহান প্রচেষ্টায় শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতি তাঁকে আরও শক্তিশালী করেছিল। বিশেষ করে হায়দ্রাবাদের ব্যাপারে তিনি প্যাটেলের পাশে সবসময় থেকে তদন্তের দাবী করতে থাকেন। এই কারণে তিনি নেহেরুর কোপভাজন হন। মন্ত্রী থাকাকালীন হিন্দু-মহাসভার অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দেয়। তিনি মনে করতেন সময়ের সাথে সাথে নতুন পরিসরে হিন্দু মহাসভার আরও বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের পরামর্শ মানা হয়নি। তখন ১৯৪৮ সালে তিনি পার্টি ছেড়ে দেন। এরপর তিনি কোনো পার্টি ছাড়াই নেতা ছিলেন। ১৯৫০ সাল

পর্যন্ত এই পরিস্থিতি ছিল।

এই দু-বছর স্বল্প কার্যকালে বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রীরূপে শ্যামাপ্রসাদ যে কাজ করেছেন, তা অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। অবিভক্ত বাংলায় অর্থমন্ত্রী রূপে তাঁর অনুভব এবং যে-কোনো বিষয়ের উপর অসামান্য জ্ঞান ও দক্ষতা অপরিসীম ছিল। আসলে এই কার্যকালে তিনি ভারতের শিল্পনীতির ভিত্তি তৈরির একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের প্রারম্ভিক জীবনীকারদের একজন বলেছেন—আড়াই বছরের জন্য শিল্প এবং বাণিজ্যমন্ত্রীরূপে তাঁর কাজের খতিয়ান, তাঁর প্রতি বিশ্বাসকে ন্যায়োচিত প্রমাণ করে। কৃষি প্রধান দেশে শিল্পকরণের বাস্তবিক সমস্যার বাস্তবিক বোধ এবং বৌদ্ধিক দক্ষতা তাঁর ছিল। তিনি মনে করতেন বিদেশীসরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে ভারতের শিল্পের উন্নয়নকে আটকে রেখেছিল। শ্যামাপ্রসাদের বৌদ্ধিক দক্ষতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং কঠিন ইচ্ছাশক্তি সহজেই তাঁর প্রতি সম্মানের ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে।

স্বাধীন ভারতবর্ষ নির্মাণের বছরগুলিতে শিল্প সমস্যা এবং সুত্রবদ্ধ শিল্পনীতির সঞ্চালন তিনি যে ভাবে করেছিলেন তার প্রশংসা বিরোধীরা পর্যন্ত করতেন। শিল্পের দিশা নিয়ে শ্যামপ্রসাদের সুস্পষ্ট বিচারধারা ছিল যে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আশ্বস্ত ছিলেন যে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। দেশের সুরক্ষার জন্য বিশেষ করে সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে স্বনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। তার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সব রকমের প্রতিষ্ঠান তৈরী করাই প্রাথমিক কাজগুলির মধ্যে অন্যতম, যাতে উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

ভারতের শিল্পের বিকাশের রূপকার ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনিই ভারতের শিল্পের বিকাশের রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই মহান কাজের প্রসংশা কখনও করা হয়নি। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীরূপে তিনি যা কিছু করেছিলেন, তাঁর কিছু বিবরণ, তথ্য এবং এই বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টার কিছু চিন্তাধারার উপর দৃষ্টিপাত করলে তা বেশ হৃদয়ঙ্গম হবে। তিনি প্রথমদিকে ভারতে শিল্পকরণে নিজের ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকে নিজের পূর্ণ

উদ্যমে যা কিছু উৎকৃষ্টতম করা সম্ভব তা তিনি করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন রাজ্যগুলি নিজের ছোটো ছোটো সংস্থানগুলিকে শিল্পের বিকাশের জন্য ব্যবহার করুক। যার উন্নয়ন নিশ্চিতরূপে দেশের সুরক্ষার জন্য অনিবার্য, যার জন্য সহজে পুঁজি পাওয়া সম্ভব হয়। তিনি দেশের বাস্তব সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত করে অতিদ্রুত কিন্তু বাস্তবিকরূপে দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য নিজ এবং সার্বজনিক উদ্যমের মধ্যে আর্থিক সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। এই নীতি তৈরি করার জন্য তিনি দেশের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির যথার্থ খোঁজ করেছিলেন। হঠকারিতা করে সিদ্ধান্ত নেননি।

তখন একটা সময় এসেছিল যখন পশ্চিমে প্রশিক্ষিত সাম্যবাদী বিচারকেরা বিফল আর্থিক সিদ্ধান্তগুলির জোর কদমে প্রচার করছিল, আর ভারতবর্ষের সর্বহারাদের উন্নয়নের জন্য লালায়িত মনে হচ্ছিল। এটা সেই সময়, যখন এই সাম্যবাদীরা ভারতের শিল্পন্নোয়নের বিরুদ্ধে হিংসা, বন্ধ, হরতালের মাধ্যমে অবরোধ করা শুরু করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ সর্বদা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য তৎপর থাকতেন। উন্নতির উপায়রূপে বর্গসংঘর্ষের ধারণা তাকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে নি।

তিনি শ্রম এবং সম্পদের মধ্যে লাভের অংশীদারিত্বের কথা ভেবেছিলেন, যাতে শিল্পের বাস্তবিক উন্নয়নের জন্য শ্রমিকদের সক্ষম করে তোলা যায়। শ্রমিক কল্যাণের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য সর্বদা ব্যাগ্র এবং চিন্তিত থাকতেন। সম্পদের সমস্যার ব্যাপারে বাস্তবিক এবং ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ নিবেশকারীদের ভরসা যোগাত।

খোলা মনের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মানুষের জন্য উপযোগী এবং ব্যবহারিকতার দিক দিয়ে উপযুক্ত এমন যোজনা এবং নীতি তৈরী করতেন। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি মনে করতেন—সমস্ত শিল্পকে রাষ্ট্রীয়করণ করা এবং পুরো দক্ষতার সঙ্গে তা পরিচালনা করার জন্য ভারতের কাছে প্রয়োজনীয় সংগঠন, অনুভব এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব আছে। একটা শক্তিশালী আর্থিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং যুবকদের প্রশিক্ষিত

করে, তারপরই এক সুদৃঢ় শিল্পকরণের ভিত্তি নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর ভাষণে এবং চিন্তাধারাতেও এই দৃষ্টিকোণ দেখা যায়।

একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শ্রী মুখার্জী স্বাধীন ভারতে সবথেকে সফল চারটি পরিযোজনা শুরু করার কারিগড়। পরবর্তীকালে যেগুলি স্বাধীন ভারতের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মান্যতা পায়। ১৯৪৮ সালে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জন শহরে গড়ে ওঠে রেলইঞ্জিন কারখানা। যেখানে প্রথম ভারতীয় বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরী করা হয়। ডঃ মুখার্জী হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট কারখানার পুনঃউদ্ধার ও পুনঃগঠন করেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় বায়ু সেনার জন্য জেট এয়ারক্রাফ্ট এর এসেম্বল করা হয়। ভারতীয় রেলের জন্য স্টীল রেল কোট, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী বেসরকারী পরিবহনের জন্য বাসগুলির বাহ্য ফ্রেম তৈরী করা হয়। এই ভাবে শ্রী মুখার্জী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুণ হওয়া ক্ষতিকে সুযোগে রূপান্তরিত করে দেন।

ভিলাই স্টীল কারখানা তৈরীর পরিকল্পনাও ডাঃ মুখার্জীর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক ভারত গড়ে তোলার জন্য প্রধান প্রয়োজন ইস্পাতের আর তার জন্য চাই স্টীল কারখানা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রী মুখার্জী ভালোভাবেই জানতেন একটি স্বাভিমানি রাষ্ট্রের নিজস্ব নিউজ প্রিন্ট উৎপাদন কারখানা থাকা চাই। ফলে মধ্যপ্রদেশে গড়ে ওঠে জাতীয় নিউজ প্রিন্ট ও পেপার মিলস্ লিমিটেড।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু তাসত্ত্বেও ভারতের মানুষের খাদ্যাভাব কেন? কারণ ভারতে তখনও আধুনিক চাষের পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। আধুনিক চাষের জন্য চাই আধুনিক সার, জল ও বিদ্যুৎ। শ্রী মুখার্জীর প্রায় একক প্রচেষ্টা বিহারের সিন্দ্রিতে গড়ে ওঠে বিশাল রাসায়নিক সার কারখানা। শ্রী মুখার্জী ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ হল বাংলা ও বিহার পারস্পরিক স্বার্থ ভুলে ডিভিসি গঠনে সম্মত হওয়া। দামোদর ও তার সঙ্গী নদীগুলি উপর গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি বাঁধ। ফলে এক কালের বাংলার শোক দামোদর পশ্চিমবঙ্গের জন্য আশীবার্দের রূপ নেয়। এখানে গড়ে ওঠে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বর্তমান ঝাড়খণ্ড বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়ে ওঠে।

এইভাবেই হয়ত ডাঃ মুখার্জী তার স্বল্প কার্যকালে বিভাজনের আঘাতে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গকে কিছুটা স্বস্তি দিতে চেয়েছিলেন।

শ্রী মুখার্জী যে শুধু বৃহৎ শিল্প নিয়েই ভাবতেন তা নয় তিনি ক্ষুদ্র শিল্প নিয়েও যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতেন। ভারতভাগের ঠিক পরে তামিলনাড়ুতে দেশালাই তৈরীর সঙ্গে যুক্ত প্রায় দুই শতাধিক কুটির শিল্প প্রায় ধ্বংসের মুখে চলে যায়। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরাট বাজার হাত ছাড়া হয় অন্য দিকে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সুইডেনের দেশলাই কোম্পানী ভারতীয় বাজারে একাধিপত্য জমাতে চাইল। বৈদেশিক চাপ ও বহুজাতীয় কোম্পানীদের জোটের হাত থেকে ক্ষুদ্র শিল্পকে রক্ষা করতে জাতীয় উৎপাদন শুরু করেন। দেশলাই শিল্পের বিকাশের জন্য দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা ও কাঁচা মালের আমদানীর রাস্তা খুলে দেন। তিনি তৎকালীন মাদ্রাজ সরকারকে নির্দেশ দেন যাতে সরকার এই ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়। শ্রমিকদের সমবায় সংগঠনের মধ্যে আনা হোক এবং সরকার তাদের সহজ শর্তে ঋণ দিক এ জন্যও তিনি নির্দেশ দেন। শ্রী মুখার্জীর স্বল্প কার্যকালে এ রকম বহু উদাহরণ আমরা দেখতে পাই।

শ্রী মুখার্জী ছিলেন প্রকৃত জননেতা। তার বিশ্বাস ছিল প্রত্যেকের হাতে কাজ না দিতে পারলে দেশ কখনও আগে বাড়তে পারে না। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ রেশম, সুতি, উল, বস্ত্র শিল্পে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু ইংরেজরা নিজেদের দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। স্বাধীনতার সময় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প প্রায় মৃত্যুপ্রায়, তাসত্ত্বেও দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন এই শিল্প। শিল্পমন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ প্রথমেই এই শিল্পের উত্থানের জন্য কোমর বেঁধে নামেন। কেন্দ্রীয় সরকারে শিল্পমন্ত্রী ডাঃ মুখার্জীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একে একে গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড, কেন্দ্রীয় উল প্রযুক্তি সংস্থার মতো সংগঠন, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদান। শুধু এখানেই থেমে থাকেননি শ্রী মুখার্জী। তিনি ভারতবর্ষের এই হস্তশিল্পিরা যাতে শুধু দেশের বাজার নয় বিদেশের বাজারও পান তার জন্য সচেষ্ট হন। দিল্লিতে সেন্ট্রাল কটেজ এম্পোরিয়াম বানানোর প্রস্তাব শ্রীমুখার্জী

দেন যার উদ্দেশ্য উৎপাদিত বস্তুর বিপণন। শ্রীমুখার্জী বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় বাণিজ্য কমিশনারদের আদেশ দেন যাতে সব জায়গায় নানা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রচার প্রসার করা হয়। শ্রীমুখার্জীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অল্পকালের মধ্যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করে। ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়।

শ্রী মুখার্জী যদিও স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু তার কাজ তাকে কেবল শিল্পমন্ত্রীর তকমায় বেঁধে রাখতে পারেনি। তার ব্যক্তিত্ব তাকে বিশ্বনেতার শ্রেণীতে পৌঁছে দিয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে কনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে তার বিশ্বজোড়া পরিচয় আগেই ছিল তারপর জন্মের আগেই জিন্নার স্বপ্নের পাকিস্তানকে খণ্ডিত করে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে আনার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বিশ্ব নেতাদের চমকে দেয়। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষে বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে শ্রী মুখার্জীর যোগদান কূটনৈতিক মহলে সম্মান আদায় করেছিল। শ্রী মুখার্জী ছিলেন ভারতের মহাবোধি সমাজের প্রথম অবৌদ্ধ অধ্যক্ষ। বার্মা (মায়ানমার), শ্রীলঙ্কা, ও তিব্বতের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সম্পর্ক রচনার পটভূমি শ্রী মুখার্জী গড়ে তোলেন। এই সম্পর্ককে স্থায়ী করার জন্য শ্রী মুখার্জী ইংল্যান্ড থেকে বুদ্ধের দুই শিষ্য মহাসোগলানা ও সারীপুত্রের দেহ অবশেষ এনে তার কিছু অংশ এই বৌদ্ধ দেশগুলিকে প্রদান করেন। কম্বোডিয়ার রাজকুমার নোরোদম সিংহানুক শ্রী মুখার্জীকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার জন্য একটি সভার আহ্বান করেন সেখানে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়। এই সভাতেই শ্রী মুখার্জী নতুন এশিয়ার নতুন যুগ আনার আহ্বান করেন। আজ থেকে ৬৫ বছর আগে এই ডাক দেওয়ার মত বুকের পাটা কম মানুষের ছিল কিন্তু আজ আর একথা অবিশ্বাস্য নয়। বার্মাকে দেওয়া অবশেষের কিছু অংশ রেঙ্গুনের কাছে এক পৌরাণিক বৌদ্ধ স্তম্ভে স্থাপিত করা হয়েছে। বার্মা বাসীর পক্ষ থেকে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী তার চিঠিতে লেখেন, আমাদের দেশের মানুষ মৈত্রীপূর্ণ এই মহান পবিত্র কাজের জন্য সবসময় শ্রীমুখার্জীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

১৯৫০ সাল, পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দু মুক্ত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর শুরু করে

অত্যাচারের জোয়ার। সরকারী প্রশাসন ও পুলিশ পুরোপুরি হিন্দুশূন্য পাকিস্তান করার কাজে নেমে মৌলবাদীদের শরণ নেয়। হত্যা, ধর্ষণ, হিন্দু মন্দির ধ্বংস, জমি দখল পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য ঘটনা হয়ে ওঠে। সম্মান বাঁচানোর উদ্দ্যেশে হিন্দু শরণার্থীর ঢল নামে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা তখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী পদে ছিল। কিন্তু অত্যাচারের সীমা এতটাই বেড়ে যায় যে তারা ভারত সরকারকে বার বার আবেদন পাঠাতে থাকে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বিশ্বনেতা হওয়ার স্বপ্নে এতটাই বিভোর ছিলেন যে তিনি এই সমস্যাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরিন সমস্যা বলে মনে করতেন এবং সেখানে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। ডাঃ মুখার্জীর প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের অন্য নেতারা বুঝতে পারেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দুর্দিনে ভারতের চুপ থাকা অনুচিত। অন্যদিকে দেশে নেহেরুর বিরুদ্ধে জনমতও গড়ে উঠছিল শ্রী মুখার্জীর প্রচেষ্টায়। শেষ পর্যন্ত শ্রী নেহেরু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে বাধ্য হন কিন্তু নেহরু নিজের ইগোকে বজায় রাখার জন্য মন্ত্রীসভার অন্য মন্ত্রীদের অমান্য করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর ফাঁদে পা দেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী নেহেরুকে একটি চুক্তি করার জন্য চাপ দেয়। চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের সুরক্ষার ভার ভারত ও ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের রক্ষার দায় পাকিস্তানের বলে স্বীকৃতি পায়। শ্রী মুখার্জী এর চরম বিরোধীতায় নামেন। শ্রী মুখার্জী বলেন, যে লিয়াকত আলী পাকিস্তানকে হিন্দু মুক্ত করার ছক এঁকেছে তার সঙ্গে চুক্তি করার কি মানে? ভারতবর্ষে মুসলমানদের উপর তো কোনো অত্যাচার হচ্ছে না, তবে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের রক্ষক হিসেবে পাকিস্তানকে কেন স্বীকৃত করা হল? ফলে দুই নেতার মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত শ্রী মুখার্জী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দেন। শ্রী মুখার্জীর সাথে সাথে কে সি নিয়োগীও ইস্তফা দেন। ইস্তফা দিয়ে কলকাতা ফেরার পরে হাওড়া স্টেশনে বিশাল জনসমাগম হয়।

নেহেরু জম্মু-কাশ্মীরে এমন এক ভুল করেন যার ফল আজও ভারতবাসী ভুগছে। মাউন্টবেটনের প্রভাবে নেহেরু এ কাজ করেছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিং চাইতেন যে কাশ্মীরকে স্বাধীন রাখা হোক।

ফলে তিনি ভারতভুক্তির বিরোধীতায় নামেন। হরি সিং-এর টালমাটালের সুযোগ নিয়ে পাকিস্থান পাঠান আদিবাসীদের ছদ্মবেশে নিজের সেনা পাঠায় কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্যে। চারিদিক থেকে কাশ্মীর তখন ছদ্মবেশী পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা আবদ্ধ। সর্দার প্যাটেল ও আর এস এস-এর তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রী গুরুজীর প্রচেষ্টায় ২৬শে অক্টোবর ১৯৪৭ মহারাজ হরি সিং ভারত বিলয় পত্রে সই করেন। এর পরেই ভারতীয় বায়ুসেনা ও স্থলবাহিনী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে যোগ দেয় কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু সেনা ও আর এস এস স্বয়ংসেবকরা। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ভারতীয় বাহিনী নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শ্রীনগরে প্রবেশ করে। একে একে পাকিস্তানি বাহিনী হার স্বীকার করে কাশ্মীর ছেড়ে পালাচ্ছে, পাকিস্তানি বাহিনী জানমাল রক্ষার জন্য হাহাকার করছে। যুদ্ধ জয়ের প্রাক্ মুহূর্তে নেহেরু কারো সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই এককভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দেন, তখনও অর্ধেক কাশ্মীর পাকিস্তানের দখলে। পাকিস্তানি সেনা হাফ ছেড়ে বাঁচে। এর থেকেও বড় কথা, এই শতকের সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক পরাজয় বলে স্বীকৃত শান্তিচুক্তি ঘোষণা করে দেন। বিজয়ের প্রাক মুহূর্তে কিভাবে জয়ী দেশের এক নেতা জয়কে দীর্ঘকালীন ক্ষততে পরিণত করে ফেলেন। আজকে জম্মুকাশ্মীরের যে সন্ত্রাসবাদ, হিন্দু বিতাড়ন, অর্ধেক অংশ পাকিস্তানের দখলে, পরবর্তীকালে কাশ্মীরের কিছু অংশ যা অক্ষয় চীন নামে পরিচিত, তা পাকিস্তানের চিনকে প্রদান সবই নেহেরুর এই হটকারিতা ও ভুলের মাশুল। এখানেই নেহেরু থেমে থাকলেন না তিনি চরম ভারত বিরোধী শেখ আব্দুল্লাকে জম্মু কাশ্মীরের 'প্রধানমন্ত্রী' নিযুক্ত করলেন এবং যুবরাজ কর্ণ সিংকে সরদার-এ রিয়াযত ঘোষণা করা হল। শেখ আব্দুল্লা তার ভারতবিরোধী নমুনা হিসেবে হিন্দু বহুল জম্মুর সঙ্গে বিভেদ মুলক ব্যবহার শুরু করে। শেখ আব্দুলার পাকিস্তান প্রীতি যখন লোকসমক্ষে প্রমাণিত তা সত্ত্বেও নেহেরু শেখ আব্দুল্লার সমর্থনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডঃ মুখার্জী তখন লোকসভায় নির্দল সদস্য, তার কোন দল নেই, কিন্তু শ্রী মুখার্জী নেহেরুর একের পর এক ভুলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। লোকসভায় নেহেরু ও শ্রী মুখার্জীর বাদানুবাদ তখন অধিবেশন চলাকালীন সবচেয়ে বেশী আলোচনার বিষয় থাকত। শ্রী মুখার্জী বুঝতে পেরেছিলেন

যে কংগ্রেস ধীরে ধীরে এক পরিবারের পার্টি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি সবশেষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সর-সংঘচালক শ্রীগুরুজীকে প্রস্তাব দেন যে আর এস এস রাজনৈতিক দল হিসেবে ভারতীয় রাজনৈতিক লড়াইয়ে অংশ নিক। কিন্তু শ্রীগুরুজী বলেন যে আর এস এস একটি সামাজিক সংগঠন। কিন্তু শ্রী গুরুজী ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে একমত ছিলেন যে সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন। শ্রীগুরুজী ডঃ মুখার্জীকেই এই রাজনৈতিক দল গঠনের পরামর্শ দেন। শ্রী মুখার্জী শ্রীগুরুজীর সাহায্য চান। তখন শ্রীগুরুজী পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, বলরাজ মাধক, অটলবিহারী বাজপেয়ী, কুশাভাউ ঠাকরে, নানাজী দেশমুখ, সুন্দরসিং ভাণ্ডারী, জগদিশ প্রসাদ মাথুর-এর মত কিছু যোগ্য কার্যকর্তা ডাঃ মুখার্জীর হাতে তুলে দেন।

২১ অক্টোবর ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘের স্থাপনা করেন শ্রী মুখার্জী। জনসংঘের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে তার প্রথম ভাষণে শ্রী মুখার্জী বলেন, আমাদের দল মানুষকে সাথে নিয়ে সুখী ও উন্নত ভারত গড়ার প্রচেষ্টা চালাবে। কংগ্রেসের একনায়কতন্ত্র সুলভ ব্যবহারের কারণে সামনে কোনো শক্তিশালী সর্বভারতীয় বিরোধী শক্তি নেই। আজ আমাদের জনসংঘ সর্বভারতীয় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, আমরা মুখ্য বিরোধী দল হিসেবে ভারতরর্ষে সুস্থ গণতন্ত্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাবো। আমাদের দলের দরজা সকল জাতি, ধর্ম, সমুদায়ের জন্য খোলা। আমরা সবধরনের অর্থপূর্ণ পরম্পরা, আচার ব্যবহার, ধর্ম, ভাষাকে স্বীকার করি যেগুলি ভারতের বিবিধতার মধ্যে একতাকে প্রকট করে, আমরা পরস্পরের সঙ্গে এক অটুট বন্ধনে যুক্ত। আমাদের ভক্তি ভারত ভক্তি। কিন্তু জাতি ধর্মের ভিত্তিতে তোষণ দেশকে আবার ভাঙনের পথে নিয়ে যাবে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীমুখার্জী বলেন আমাদের পার্টি মনে করে ইউনাইটেড নেশন থেকে জনমত সংগ্রহের প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে হবে। কাশ্মীরও অন্যপ্রান্তগুলির মতই ভারতবর্ষের অভিন্ন অংশ।

নেহেরু সব সময় শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বলে হেয় করার চেষ্টা

চালাতেন। জবাবে শ্রী মুখার্জী বলেন, বারবার মুসলিম মৌলবাদের সামনে মাথা নত করে ভারতীয় রাষ্ট্রবাদের অপমানকারী, বিভাজনের পরও পাকিস্তান সরকারের সামনে নেহেরু নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের পর অন্য কাউকে সাম্প্রদায়িক বলার অধিকার নেহেরুর নেই। ডঃ মুখার্জীর কথা আজকের দিনে আরও প্রাসঙ্গিক, ভারতবর্ষে মুসলিম তোষণ ছাড়া কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই যেটা শুধু ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে নেহেরু ও তার দল কাজে লাগায়। বর্তমানে আমাদের দেশে যে প্রাদেশিকতাবাদ, জাতিবাদ রয়েছে সে বিষয়গুলিও নিজের সভাপতির ভাষণে শ্রী মুখার্জী উল্লেখ করেছিলেন।

শ্রী মুখার্জী তার ঐতিহাসিক ভাষণের শেষে বলেন, আমরা পূর্ণ বিশ্বাস, আশা ও সাহসের সঙ্গে নিজের কাজ শুরু করবো। আমাদের যারা আগামী দিনের কার্যকর্তা তারা সব সময় মনে রেখো সেবা ও ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষের মন জয় করা যায়। ভারতবর্ষের পুনর্জীবন ও পুণর্নির্মাণের মহান কাজ আমাদের ব্রত। ভারতমাতা নিজের সন্তানদের জাতি, ধর্ম, প্রান্তের ভেদ ভুলে নিজের কাছে ডাকছেন। আমরাও তার সেবায় এগিয়ে আসবো। যদিও বর্তমানে অন্ধকার রয়েছে তা সত্ত্বেও বলা চলে আগামী দিনে প্রভাত ভারতবর্ষের। আমাদের নির্বাচন চিহ্ন প্রদীপের মত আমরাও আগামী দিনে একতা, বিশ্বাস ও সাহসে ভর করে এই অন্ধকার দূর করবো। বিধাতা আমাদের শক্তি দিন। আমাদের ভয় ও লোভের হাত থেকে রক্ষা করুন। ভারতবর্ষকে মহান ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে আমাদের সহযোগীতা করুন।

নেহেরু ড: মুখার্জীর জনপ্রিয়তাকে ভয় পেয়েছিলেন। সংসদে বক্তব্য চলাকালীন নেহেরু খোলাখুলি বলেন, I will crush Janasangh (আমি জনসংঘকে ধ্বংস করে দেব) জবাবে শ্রী মুখার্জী বলেন, আমি বলছি, আমি আপনার এই মানসিকতাকেই ধ্বংস করে দেব। (I will crush this crushing mentality of yours).

1951-52 প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনসংঘ ৩টি আসনে জয়লাভ করে তার দুটি পশ্চিমবঙ্গে ও একটি রাজস্থানে। কিন্তু শ্রী মুখার্জীর ব্যক্তিত্ব তাকে স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধী ব্লকের নেতা করে দেয়। সংসদে শ্রী নেহেরু ও শ্রী

মুখার্জীর বাদানুবাদ সংসদীয় ইতিহাসের এক স্বর্ণময় অধ্যায়।

ইতিমধ্যে কাশ্মীরে এক নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করা হয় নেহেরু-আবদুল্লার চুক্তিতে। কোন ভারতীয় যদি কাশ্মীরে প্রবেশ করতে চায় তাকে কেন্দ্রীয় রক্ষামন্ত্রক থেকে অনুমতি নিতে হবে। শ্রী মুখার্জী এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। তিনি ঠিক করেন এর বিরুদ্ধে জনআন্দোলন গড়ে তুলবেন। এজন্য তিনি নিজেই কাশ্মীরে বিনা পারমিট এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অন্য দিকে জম্মুতে এই আইনের বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনের উপর নেমে আসে চরম অত্যাচার।

৮মে ১৯৫৩ শ্রী মুখার্জী দিল্লি থেকে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সঙ্গে বৈদ্য গুরুদত্ত, টেকচন্দ্র, বলরাজ মাধক ও ব্যক্তিগত সহকারী অটলবিহারী বাজপেয়ী। রাস্তায় আম্বালা, জলন্ধর, পাঠানকোটে কয়েকটি সভাতে মুখার্জী সম্বোধনও করেন। দেশে ইতিমধ্যে জনজাগরণ শুরু হয়ে গেছে। গুরুদাসপুর থেকে ট্রেনে সেখানকার জেলাশাসকও ওঠেন যাতে শ্রী মুখার্জী কাশ্মীরে ঢুকতে চাইল তাকে গ্রেফতার করা হয়। এটাই এখানকার নিয়ম ছিল কারণ কাশ্মীর পুলিশ কাশ্মীর ঢোকার অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করতে পারত না। কিন্তু ডঃ মুখার্জী কাশ্মীর সীমায় ঢোকার সময় এক অজানা আদেশে তাকে কোনো বাধা দেওয়া হল না। কেন, তার উত্তর আজও অজানা। কিন্তু কাশ্মীর সীমান্ত ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে জন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে বলে গ্রেফতার করা হল এবং বটোটে বলে একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল। পরের দিন সেখান থেকে শ্রীনগর। তাকে রাখা হল জনশূন্য এক জায়গায়। এমনকি অসুস্থ মুখার্জীকে ডাক্তারের সুবিধাও দেওয়া হল না। কারো সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগও দেওয়া হল না। ১৯-২০ জুন রাতে ডঃ মুখার্জীর বুকে ব্যাথা দেখা দেয়। ২১ জুন তার শারিরীক অবস্থা আরও খারাপ হয় কিন্তু কাশ্মীর সরকার কোন পদক্ষেপ নেয় না। অবস্থা যখন একেবারে খারাপ তখন লোকদেখানো ভাবে ট্যাক্সিতে করে রাজ্য সরকারী হাসপাতালের (গাইনকলজিকল) মহিলা বিভাগে ভর্তি করা হয়। তার জামিনের জন্য ব্যারিস্টার ইউ এম ত্রিবেদি শ্রীনগর এলে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়, যখন ডাক্তার শ্রী মুখার্জীকে দেখছিলেন সেই

সময়। ডাক্তার শ্রী ত্রিবেদিকে বলেন চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু হঠাৎ ২৩ জুন সকাল ৩ টে ৪০ মিনিটে জানা যায় শ্রী মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছে।

ডঃ মুখার্জীর শেষ কাশ্মীর যাত্রা পুরোটাই রহস্যময়। ডঃ মুখার্জীর মা নেহেরুর কাছে এই রহস্য জানার জন্য অনুসন্ধান কমিশন গড়ার দাবী করলে নেহেরু সরাসরি না করে দেন। কমিটি গড়ার দাবী বিপক্ষের সবকটি দল এমনকি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসও করেছিল কিন্তু নেহেরু মানতে চাননি।

বর্তমানে শ্রী মুখার্জী আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তার আদর্শ বিজেপি রূপি জনসংঘের প্রকাশ সারা ভারতকে আলোকিত করছে। ডাঃ মুখার্জীর আহ্বান আজ কয়েক কোটি বিজেপি সদস্যের হৃদয়ের আওয়াজ। বিজেপি এক মহান ও শক্তিশালী ভারতবর্ষ গড়তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত হিন্দু বৌদ্ধ-খৃষ্টান শরনার্থীদের সম্মান দিতে এই বিজেপি স্থির নিশ্চয়। যে স্বপ্ন শ্রী মুখার্জী দেখেছিলেন কাশ্মীরকে ভারতবর্ষের সাথে একাত্ম করতে, যে জন্য ডঃ মুখার্জী বলিদান দিয়েছিলেন। গণতন্ত্রকে বলীয়ান করতে তোষণের নির্লজ্জতা ত্যাগ করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য যা ছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্বপ্ন।

সবাইকে নিয়ে সবার জন্য উন্নয়ন।

শেষ যাত্রা

স্বাধীন ভারতের প্রথম শহীদ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে প্রবেশের পথে 'পারমিট' আইন অমান্যের জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন। একথাই প্রচার করা হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অন্যরকম ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ আইনের বলে 'কাশ্মীর' অংশ এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ পেয়ে যায়। বাকী ভারতীয়দের কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য পাশপোর্টের মতো পারমিট বা অনুমতি নেবার আইন তৈরি হয়। কাশ্মীরের নিজস্ব 'নিশান, বিধান ও প্রধান' থাকার এই আইন তৈরি হয়। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সারা দেশের জন্য এক নিশান এক বিধান ও এক প্রধান-এর দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। কাশ্মীরে এই আন্দোলন জোরদার হলে মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে।

কলকাতা থেকে নির্বাচিত সাংসদ, বিরোধী দলের নেতা ও ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ও জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী (কাশ্মীরে তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) শেখ আবদুল্লাকে পত্র লেখেন এবং তার উত্তরও পান। কিন্তু সেই পত্রগুলিতে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই মতান্তরের অবসানের জন্য ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং প্রয়োজনে শান্তি স্থাপনের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯৫৩ সালের ৮ মে শ্যামাপ্রসাদ শেখ আবদুল্লাকে এই মর্মে তারবার্তা পাঠান, যার প্রতিলিপি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও পাঠিয়ে দেন।

পরের দিন ৯ই মে, '৫৩, শ্যামাপ্রসাদ শেখ আবদুল্লার কাছ থেকে তাঁর টেলিগ্রাফের উত্তর জানতে পারেন। শেখ সাহেবের মতে এই পরিকল্পনার জন্য এটি আদর্শ সময় নয়। শ্যামাপ্রসাদ তবুও ভারত সরকারের কাছ থেকে কোনও অনুমতি বা পারমিট না নিয়েই তাঁর যাত্রা সচল রাখেন। ১১ মে

শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সহকর্মীরা পাঠানকোট থেকে জম্মু অভিমুখে রওনা হবার সময় গুরুদাসপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এসে তাঁদের জানিয়ে দেন যে, সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, বিনা পারমিটেই শ্যামাপ্রসাদ জম্মু ও কাশ্মীরে যেতে পারবেন এবং তিনি ডঃ মুখার্জীকে সমস্ত রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। এমনকি তারা শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সহকর্মীদের মাধোপুর চেকপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে শুভকামনা জানান।

এরপরেই মাধোপুর চেক পোস্টের ধারে রাভি নদী পার হয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যান শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর বাহিনী। তখন সেতুর মধ্যস্থলে কাশ্মীর সরকারের পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে। সেখানে পৌঁছতেই ডঃ মুখার্জীকে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মুখ্য সচিবের ১০.৫.১৯৫৩ (অর্থাৎ আগের দিনের তারিখে) তারিখে স্বাক্ষর করা 'জম্মু ও কাশ্মীরের জন সুরক্ষা আইনের স্বার্থে শ্যামাপ্রসাদ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের কোথাও প্রবেশ করতে পারবেন না'— শীর্ষক আদেশনামা ধরিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের স্বাক্ষর করা ১১.৫.১৯৫৩ তারিখের গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কাথুয়া'র এস পি ক্যাপ্টেন এ. আজিজ-কে এই আদেশ পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ডঃ মুখার্জীর মতো দেশবরেণ্য নেতাকে গ্রেফতারের সময় আদেশকারীরা কিন্তু কেউই উপস্থিত ছিলেন না।

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার বেআইনীভাবে এই গ্রেফতারপর্ব সমাধা করেছিল। ডঃ মুখার্জীকে গ্রেফতার করার অধিকার ছিল একমাত্র ভারত সরকারের। কেন না পারমিট আইন প্রয়োগ করার অধিকার ভারত সরকারের, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নয়। যদিও শেখ আবদুল্লা ২৬ জুন, ১৯৫৩ তারিখে এক বক্তৃতায় বলেছেন, পারমিট ব্যবস্থার দরুণ আমাদের কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়, তবু ভারতের জাতীয় সুরক্ষার জন্য যা করণীয় তা মেনে নিতে হবে। কারণ প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে দেশের প্রতিরক্ষার দাবি সর্বোপরি। (ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৭ জুন ১৯৫৩)

যে দুটি আদেশবলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেই দুটি আদেশের কোনওটিতেই পারমিট না থাকার জন্য গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে কোনও

উল্লেখ ছিল না।

স্বরাষ্ট্র সচিবের স্বাক্ষর করা আদেশনামা (382 - F 53 of 1953, dt. 10.5.1953)-তে পরিষ্কার লেখা হয়েছিল, "ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জন নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত করার মতো কাজ করেছেন, এবং করতে উদ্যত হয়েছেন।" দুটি আদেশনামাতেই একই কথা লেখা হয়েছিল। একটিতে প্রবেশ কার্যকরী না করা, অপরটিতে গ্রেপ্তার করার আদেশ ছিল— আদেশ দুটি পাওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ প্রতিবাদও করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাকে ভারতের সরকার এগিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে। এখন এসব আবার কি?"

অবশেষে শ্যামাপ্রসাদ জম্মু ও কাশ্মীরের ভূমিতে প্রবেশ করলেন, তাঁর ভাষায়, "আমি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করেছি, যদিও এক বন্দী হিসাবে।"

শ্যামাপ্রসাদের গ্রেফতারের পেছনে আরও একটি চক্রান্ত লুকিয়ে ছিল। শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর যাত্রার মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁকে দিল্লীতে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু সেই গ্রেফতার হওয়া অবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে (Haveas corpus দরখাস্তের কারণে) তিনি অচিরেই মুক্তি পান।

এই সময় জওহরলাল ইংল্যাণ্ডের রাণীর রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগ দিতে ভারতের বাইরে যান। অন্যান্য দেশ ভ্রমণের পর তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল (শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর সময় তিনি জেনিভাতে ছিলেন)। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য যেহেতু সেইসময় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আওতায় ছিল না, সেইজন্যই তাঁকে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, যাতে তাঁকে গ্রেফতার করা যায় এবং ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের আওতার বাইরে রাখা যায় বিচারাধীন বন্দী করে।

শ্যামাপ্রসাদের গ্রেফতারের আগে দিল্লীতে তাঁর বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা-ভঙ্গের অভিযোগে একটা ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল। অনুমান করা হচ্ছিল, তাঁর গ্রেফতারের পর কাশ্মীর সরকার দিল্লীর সেই

মামলায় বিচারের সম্মুখীন হবার জন্য তাঁকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবে। কেন না, প্রকৃতই যদি শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর প্রবেশ ও সেখানে থাকা কাশ্মীর সরকার অবাঞ্ছিতই মনে করে, তাঁকে সেখান থেকে বার করে দেওয়ার এই ছিল সহজ সুযোগ। কিন্তু দিল্লীর বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট যখন শ্যামাপ্রসাদের জবানবন্দী গ্রহণের জন্য তাঁকে ফেরত পাঠাতে বলেন, কাশ্মীর সরকারের মুখ্য সচিব দিল্লী ম্যাজিস্ট্রেটর সে অনুরোধ রক্ষায় অসম্মতি প্রকাশ করে উত্তর দেন, "সময় এখন অল্প, বিচারকালে শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতি যদি একান্ত প্রয়োজন হয়ই তখন ব্যবস্থা করা যাবে।"

এদিকে দিল্লীর কেন্দ্র সরকার সাবধান হয় এই সুযোগে যেন শ্যামাপ্রসাদ দিল্লী ফিরে না আসেন। এই মামলার সাক্ষী পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তারিখ পড়তে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেটের সন্দেহ হয়। তিনি নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, স্থানীয় সিভিল সার্জনকে পাঠান সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য। ২ জুন সিভিল সার্জেন রিপোর্ট পাঠান— "সাক্ষীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।" সেই তারিখেই বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর নোট-এ লিখলেন, কাশ্মীর সরকারের চীফ সেক্রেটারি তাঁকে জানিয়েছেন যে ডাক্তার মুখার্জীকে তাঁর কোর্টে অদূর ভবিষ্যতে হাজির হতে দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। শ্যামাপ্রসাদের বন্দীকাল ১৩ জুলাই অবধি ছিল। ১৫ জুলাই অবধি মামলা মুলতুবী রাখা হচ্ছে।

শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ—
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত